Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – II, Issue-I, published on January 2022, Page No. 1 –6
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

আব্দুল জব্বারের 'ইলিশমারির চর' : পেশায় ঘনিষ্ঠ জেলে-মাঝিদের জীবন

দিব্যেন্দু ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: dibyendughosh685@gmail.com

Keyword
পেশা, মহাজনী নিপীড়ন, যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসন, শ্রেণীবদ্ধ সংগ্রাম, শোষণমুক্তি

Abstract
কথাসাহিত্যিক আব্দুল জব্বারের 'ইলিশমারির চর' উপন্যাসে জেলে-মাঝিদের জীবনের নিখুঁত ছবি উপস্থাপিত। বিশেষত ঐ সম্প্রদায় কেমনভাবে নিজেদের পেশাকে অবলম্বন করে জীবনযাপন করে তা নিয়ে শৌখিন কাব্যবিলাস নয়, বরং বাস্তবঘনিষ্ঠতার স্বাদে এ উপন্যাস সম্পৃক্ত। কুসীদজীবীর পীড়নে দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের কথা তো রয়েইছে উপরন্তু সমাজতন্নিষ্ঠ গবেষকের মতো লেখক দেখিয়েছেন কেমনভাবে বংশগত পেশা থেকে উৎখাত হয়ে যন্ত্রসভ্যতার করাল গ্রাসের কাছে নিজেদের সঁপে দিতে বাধ্য হচ্ছে ঐ গোষ্ঠীর লোকেরা। তবে নিরাশাতেই শেষ নয়, ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন কীভাবে নিপীড়িত মানুষ নিজেদের শ্রেণীস্বার্থবুদ্ধিতে একত্রিত হয়ে কঠিন প্রতিরোধ গড়েছে অর্থলিপ্সু মহাজনদের বিরুদ্ধে। নির্দিষ্ট পেশালগ্ন মেহনতী মানুষদের জয় শোষণমুক্তির ইউটোপিয়ান জগৎকে মাটির কাছাকাছি এনে ফেলেছে।

Discussion
আব্দুল জব্বার বিরচিত 'ইলিশমারির চর' (১৯৬১) জেলে-মাঝিদের জীবন নিয়ে একটি প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা। উপন্যাসের 'সবিনয় নিবেদন' অংশে লেখক জানিয়েছেন যদিও এই বিশেষ সম্প্রদায়কে নিয়ে তাঁর পূর্বসূরীদের রচনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তবু যাদের জীবন ”হতাশা, দুর্দশা, অত্যাচার আর শোষণে মুমূর্ষু”[১] তাদের ভাবনায় জারিত হয়েই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ গ্রন্থের রচনা। তবে আব্দুল জব্বার সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন ধীবর শ্রেণীর ভালো লাগাকেই। আসলে যাঁদের জীবন নিয়ে বৃত্তান্ত রচনা তাঁরাই সবচেয়ে ভালো বলতে পারেন তাঁদের 'জীবন কথায়' কোথায় খাদ রয়ে গেছে। ঠিক এই কথাটাই তো বলেছে রতন তার শহরাগত শৌখিন বন্ধু প্রদীপকে “এই নিম্নশ্রেণীর লোকেদের... জীবনে জীবন যোগ করে মিশতে বা এদের জানতে পারবি তো ! নইলে নিজের মতলবে আর ওদের কিছু দূর থেকে জেনে খিচুড়ি পাকিয়ে জেলেদের বাস্তব-জীবন বলে ছেড়ে দিবি, কেউ হয়তো বা পুরস্কারও দেবে, আমরা পড়ে হাসবো না কাঁদবো, ভেবে পাবো না। উলঙ্গ আদিম জীবনের লীলা-নিকেতন করিসনে যেন জেলেদের গ্রামকে।”[২]

এর কারণ রতন বয়সে অল্প হলেও বুঝে গেছে এক গভীর সত্যকে। হয়তো এই আধেক কল্পনা আর বাস্তবে মেশামেশি আখ্যানে লেখক-পাঠকের তৃপ্তি ঘটলেও ধীবর সমাজের কোনো উন্নয়নই হবে না। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মালো সম্প্রদায়ের উন্নয়নের প্রচেষ্টাতে সফলকাম তো হতে পারেনি 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের অনন্ত। রতনদের যৌথ প্রচেষ্টাতে অবশ্য আশার আলো আছে।

আমরা মনে করি আব্দুল জব্বারের 'ইলিশমারির চর' উপন্যাসের সার্থকতা প্রত্যক্ষ বাচনতায়। বিষয়টিকে খোলতাই করা যাক্। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' কিংবা অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম' উপন্যাসে ধীবর সম্প্রদায়ের উপর শোষণের ইতিবৃত্ত।আব্দুল জব্বারের লেখাটিতেও তার ব্যতিক্রম নেই।তবে একটা সূক্ষ পার্থক্য রয়ে গেছে। ফিউডাল ব্যবস্থা থেকে বা মেজোবাবু অনন্ত তালুকদারের শোষণ থেকে পদ্মা নদীর জেলে-মাঝিদের রক্ষা করেন হোসেন মিঞা, কিন্তু ষড়যন্ত্রের কূট চালটি বড়ো জটিল সেক্ষেত্রে। হোসেন মিঞা মূলধনের সঞ্চয়ে ও বিস্তারে যে কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন সেটিতে এক ''নির্ভুল ক্যাপিটালিস্ট''[৩] মানসিকতার পরিচয় দেখেছেন সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর 'হোসেন মিয়া, ময়না দ্বীপ ও লেখকের ইঙ্গিত'প্রবন্ধে। গরীব কুবের মাঝির যে দুর্বোধ্য লাগে হোসেনকে তার কারণ কিন্তু লুকিয়ে আছে ঐ বিশিষ্ট মানসিকতায়। হোসেন মিঞার মৃদু,মিঠা ব্যবহারেও তাই শেষাবধি রেহাই মেলে না কুবেরের, যেতেই হয় সেই ময়নাদ্বীপে। 'চরকাশেম'এ কাশেমদের- নিবারণদের হাত থেকে বাঁচতে 'চরকাশেম' দ্বীপ আদৌ সুখসমৃদ্ধি আনে না, শেষপর্যন্ত বিশ শতকের চল্লিশের দশকের কুটিল ঘূর্ণাবর্ত তাদের বিধ্বস্ত করে দেয়। তবে যে প্রত্যক্ষতায় হোসেন,নিবারণ সত্য তার চেয়ে মহাজন তরব-দি'র বিরুদ্ধে জয়নদ্দি-হরেনদের সংগ্রাম অনেক বেশী প্রত্যক্ষ সত্য আব্দুল জব্বারের আলোচ্য উপন্যাসটিতে। এই শোষণবৃত্তান্তের বিবরণ অনেকটা সমগোত্রীয় পূর্বজ কথাকার সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসের সঙ্গে। তার চেয়েও বড় কথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুবের, অমরেন্দ্র ঘোষের কাশেম, অদ্বৈত মল্লবর্মণের ধীবর সম্প্রদায় শেষাবধি বাধ্য হয়েছে পুঁজি, আন্তর্জাতিক-দেশীয় পরিস্থিতি-কঠিন যুগসত্যের কাছে অবনমিত হতে। তবে মনে রাখতে হবে গণসাহিত্য যেমনভাবে শোষকের পরাজয়ে-নিপীড়িতদের যৌথ উত্থানে সত্য হয়ে ওঠে তেমনভাবেই নতুন করে স্বপ্ন দেখিয়েছে আব্দুল জব্বারের 'ইলিশমারির চর' উপন্যাস। আবার জয় তো শুধু আঙ্কিক যোগফল নয়, ভবিষ্যতের সফল স্বপ্নের মধ্যেও তার বীজ লুকিয়ে থাকে-এই স্বপ্নের কথাই রয়েছে সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসের তেঁতলে বিলাসের সমুদ্রযাত্রার প্রসঙ্গে। স্বপ্নসম্ভব বাস্তবতায় কোথাও যেন কাছাকাছি এসে যায় 'গঙ্গা' ও 'ইলিশমারির চর' আখ্যান।

তবে ঠিক এই জায়গাতেই একটা সমস্যা এসে হাজির হয়। প্রত্যক্ষতার সুস্পষ্ট বাচনিকতায় কোথাও উদ্দেশ্যমূলকতা এসে হাজির হয় না তো? এর পক্ষে জোরালো যুক্তি আব্দুল জব্বারের বইটি উৎসর্গিত হয়েছে ধীবরদের উদ্দেশ্যেই। তাহলে তো উদ্দেশ্যমূলকতা হাজির হতেই পারে। আমরা এর প্রত্যুত্তরে একটা কথাই বলবো আব্দুল জব্বার শোষণের ম্যানিফেস্টো নয়, উপন্যাস লিখেছেন। যে কথা লেখকের উপন্যাসের চরিত্র রতন তার বন্ধু প্রদীপকে বলেছিল সেই দায়িত্ব নিয়েই তো ঔপন্যাসিক কলম ধরেছেন। ধার করা কৃত্রিমতায় সেই জীবনকে চিনতে গেলে যে শৌখিন মজদুরি হবে সেটা লেখকের অজানা ছিল না। তাই সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছিল রতনের কণ্ঠে ''তাতে তুই তৃপ্তি পাবি, পাঠক-পাঠিকার রক্তে আগুন ধরবে বটে, কিন্তু আমাদের কী হবে তাতে?''[৪] সেই বিশিষ্ট ভাবনা থেকেই আব্দুল জব্বারের এই উপন্যাস রচনা।সেই চেনার সূত্রেই লেখক কেন্দ্রীয় চরিত্র জয়নদ্দিকে নিয়ে এক বাস্তবের আখ্যান লেখেন, সেখানে জয়নদ্দির 'ছোটখাট মহাজন' হয়ে ওঠাকে আমরা বানিয়ে তোলা বলে দেগে দিতে পারি না। উপন্যাস তো 'রচা কথা' সেইসূত্রেই বলতে পারি উপন্যাসোচিত অনিবার্যতায় সার্থক হয়ে ওঠে জয়নদ্দির বিবর্তনের পথরেখাটি।

'ইলিশমারির চর' উপন্যাসটির শুরুতেই লেখক ইলিশমারির চরের মানুষের পরিচয় দিয়েছেন। গাব গাছের ভিড় এবং তালতা ও বাঁশনী বাঁশের ঝাড়ের মাঝে ঝাঁক-বন্দি জেলেদের বাড়ি। জাল শুকোবার ভারা। জালে গাবের কষ দেওয়ার গামলা বসানো বাড়ির সামনে। চোঙা-খোলায় ছাওয়া হুমড়ি-খাওয়া কুঁড়েঘর। ভাঙা ফুটো নৌকা উল্টে আছে সারাবার প্রতীক্ষায়। সারা গাঁয়ে 'শুকটি' মাছের তীব্র গন্ধ। ইলিশের মরশুমে পাড়া মাত করে ভাজা ইলিশের গন্ধ। পুরুষেরা তখন যায় গাঙে। প্রৌঢ়া আর বুড়োরা যায় ইলিশের বাজরা মাথায় নিয়ে 'পাজারী' হয়ে গঞ্জে-হাটে-বাজারে।

জেলেদের এই ভৌগলিক অবস্থানটি স্পষ্ট করে দিয়েই লেখক স্থানীয় মহাজনদের কথা বলেন। সেখানে লেখকের সুচিন্তিত মন্তব্য ''মহাজনদের কথা আলাদা। তাকে দিতে হয় সবকিছু। মাছ, টাকা, মান, ইজ্জত, মায় জীবন পর্যন্ত।''[৫] দশ-বারোটা জাল আর নৌকা খাটছে যাদের, মাছ নিয়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা তাদের নিজস্ব নিয়মে চলে। মাছের মর্জির মালিক জেলেরা নয়, তাই তাদের ভাগ্যের উপর ভবিষ্যত ছেড়ে দিয়েই চলতে হয়। মাছ বেশী হলে ভালো নইলে আশায় আশায় মহাজনের দোকানে চলে যায় ঘরের সব তৈজসপত্র; সঙ্গী হয় মারণান্তক সব জলবাহিত রোগেরা। উপন্যাসের সূচনাতেই জয়নদ্দির আক্ষেপ ''শালা, মহাজন তরব-দি চাচার বৌয়ের কাছে মোর গয়নাগুলো কড়ারি বন্ধকে সব গেল।''[৬] তবু ইলিশের মরশুমের প্রথম মাছটি যে মহাজনকেই দিতে হবে এটা জয়নদ্দি ভোলে না, হিসেবের কারচুপি তার ধাতে নেই।

তবে তরব-দি'র মতো মহাজনেরা কোনোমতেই বিশ্বাস করতে চায় না জেলেদের। নিজে নানাবিধ ধূর্ত কারবারে অর্থ রোজগার করলেও তার বলতে বাধে না ''লোকের ইমান নেই... দুনিয়ার সব শালা চোর।''[৭] জয়নদ্দি স্পষ্ট কথা লোক, অপবাদ সহ্য করা তার বাপ বা তার কারোর নেই। সে রাগতকণ্ঠে মহাজনকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলে না তার বাপের জমি-জাল-নৌকা সবই অন্যায়ভাবে গ্রাস করেছে তরব-দি। অবশ্য এতে কিছুই যায় আসে না মহাজনের, তার ভাঁড়ারে নানা চোরাই পথে মূলধন জমে পাহাড় হয়ে গেছে। বন্ধকীর কারবারে সে ফুলেফেঁপে উঠেছে। তাই মহাজনের বলতে কোনো অসুবিধাই হয় না ''টাকা থাকলে তোর কোলের বউকে কেড়ে নিয়ে গেলেও কিছু করতে পারবিনি।''[৮] এমন মহাজন নামাজ পড়লেও সে যে শয়তানের সহচর সে বিষয়ে জয়নদ্দি, কানাই বা হরেনের দ্বিমত নেই। ঠকিয়ে খেতেও তরব-দি জুড়িহীন। প্রায় নিরক্ষর মানুষগুলো মহাজনের দোকানে পরিস্থিতির চাপে পড়ে অধমর্ণ, আর সেই সুযোগটাকেই ব্যবহার করে বাকি টাকার অঙ্ক নিজের মতো বাড়িয়ে নেয় মহাজন।পাওনা আদায়ে কাবুলির মতো সে ক্ষমাহীন। জেলেদের জীবনে সে যেন সাক্ষাৎ কালান্তক যম।

নিজেদের মাছ বিক্রীর ব্যাপারে জয়নদ্দিরা সজাগ। পদী মেছুনীর ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যবহারেও জয়নদ্দির খুব যে পরিবর্তন হয় এমন নয়। ইলিশের মরশুমে পয়লা ধরা মাছকে সে মেয়েমানুষের পয়লা যৌবনের সঙ্গেই তুলনা করে। এতে যদি কেউ তাকে 'ট্যাকার পিচেশ' বলে তাতেও তার দুঃখ নেই। তার বাপের আমলে যে মাছ পড়তো, মানুষের পাপে দরিয়ার মাছেদের বাড়বৃদ্ধি কমেছে বলে যে মত জয়নদ্দির মা বলে সেটি ভাববার অবকাশ নেই জয়নদ্দির নেশার 'সাদাপানি'র দৌলতে। তবে মাছের বিষয়ে তার সতর্কতা প্রবল, কোথাও বেশী মাছ পেলে নিজের নৌকার লোক ছাড়া কাউকে বলতে সে রাজী নয়। মাছ বিক্রীর ব্যাপারে ব্যাপারীদের কাছে কেমনভাবে খুচরো 'পাজারী'রা বিকিয়ে গেছে সে কথাও তারা জানে। তবে পদীর মতো খুচরো 'পাজারী'রা যে কতোটা ধূর্ত সেটা জানে জয়নদ্দিরা। তাই তাদের চোখের জলে মেছুড়েরা ভোলে না। পেটের দায়ই রোজগারের বড় দায়, সেখানে দয়া দেখানো মানে যে নিজের পেটে নিজে ছুরি মারা সেটা তারা খুব ভালো বোঝে।

জয়নদ্দির মায়েরা গল্প বলে পুরানো কালের, যে কালের সঙ্গে দারিদ্র্য জড়িয়ে আছে একথা যেমন সত্য তেমনি সত্য মাছমারাদের বীরত্বের ইতিহাস। সিন্ধুর শ্বশুরের দরিয়ায় রক্ষা পাওয়ার ইতিবৃত্ত মেয়েরা শোনে। তবে এই জেলেদের ঘরের লোকেরাই দেখে রাত ন'টার ভোঁ বাজে যখন কারখানায় তখন দলে দলে রাতের কাজের লোকেরা ছোটে হুড়মুড়িয়ে। জেলেপাড়ার জোয়ান ছেলে-ছোকরারা প্রায় সবাই চলে যায় পাড়া ঝেঁটিয়ে। জাত-ব্যবসা তুলে দিয়েছে অনেকে। কিছু যারা আছে তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে আধা-বখরায় পুকুর-খাল-বিলের চুনোপুঁটি-চাঁদা-মৌরলা ধরে বেড়ায়। খেপলা আর ফাঁদি জালই সম্বল তাদের। তার উপর গাঙে নামতে গেলে চাই সাহস, বুকের বল, রোদেবৃষ্টিতে টিকে থাকার ধৈর্য। আর সবচেয়ে বড় চাহিদা হল নৌকা-জাল-টাকাপয়সার। টাকা নেই মানুষের যে জমায় নৌকা নেবে। জয়নদ্দির মতো লোকেরও অভাব যাদের উপর কুসীদজীবী মহাজনেরা ভরসা করে নৌকা-জাল ছাড়তে পারে। জেলেরা সবাই জানে যে তরব-দি পঞ্চাশের মন্বন্তরে এক-দেড় মণ ধানের বদলে একবিঘে-দেড়বিঘে জমি লিখিয়ে নিয়েছে। পুলিশের ভয়ে দুশো মণ চাল-ডাল পুকুরে দুবিয়ে সে নষ্ট করেছে তবু অভুক্তকে দেয়নি। গরিবের গলায় পা তুলেই তার টাকার ভাণ্ডার। জেলেরা কী করবে? পৈতৃক ব্যবসায় সেই জুলুমবাজের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতেই তারা সরে গেছে

কারখানার কাজে। অর্থাৎ পেশাগত জগতে পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভুবনে যে পরিবর্তন আসছে তার একটা ইঙ্গিত লেখক দিয়ে রাখলেন। জয়নদ্দির মতো লোকেরা তবু পুরানো পেশাতেই সংলগ্ন থাকে। যদিও তরব-দি'র মুখের উপরে ''বাপ আর ছেলে এক লয় চাচা। যুগ পেলটে গ্যাচে।''[৯] এমন কথা বলার হিম্মত অন্য কারোর নেই। কানাইরা নিজেদের সর্বনাশের বিনিময়েও মহাজনের চাটুকারিতাতে ব্যস্ত। মহাজনের ''মেয়েমদ্দকে ন্যাংটো করে কাপড় খুলে নেবো। বড্ড মান-এজ্জৎ...। শালা ছোটলোকের আবার মান-এজ্জৎ।''[১০] এই কদর্য উক্তিতেও কানাইদের ঘুম ভাঙে না, বরং স্বজাতির সঙ্গে বেইমানি করে তারা খোসামোদে ব্যস্ত থাকে। এই হল জেলেদের মহাজন আর তাদের জীবনের ইতিবৃত্ত।

তবে অন্য মহাজন তারিণীকে নিয়ে বৃত্তটি অন্যরকম। তরব-দি যে অত্যাচার চালায় তার হাত থেকে বাঁচতেই জয়নদ্দিরা তারিণীর দিকে ঝোঁকে। এই বৃত্তটি পরে বিশিষ্ট হয়ে উঠবে তারিণীর পুত্র রতনের প্রভাবে। রতন তার নাগরিক বন্ধু প্রদীপকে জেলেজীবন নিয়ে শৌখিন দুঃখবিলাস করতে বারণ করেছিল, কিন্তু সেও প্রথমে তার অনুসন্ধেয় পথের সন্ধান পায়নি। শিক্ষিত রতন নিজেকে প্রশ্ন করে সত্যিই কি তার প্রাণে ভালোবাসা আছে ঐ গরীবগুর্বো মানুষগুলির জন্য? সবটুকুই ভন্ডামি নয়তো রঙিন শখের চশমা পড়ে? না কি বইপড়া রাজনীতির নেশা? রাজনীতি যে দুর্নীতিবাজদের শেষ আখড়া এটা সে জানে। কিন্তু নাছোড় প্রশ্ন থেকে সে রেহাই পায় না তাহলে কি রাজনীতি করতে হলে স্বার্থের খাতিরে সত্য-ন্যায়-বুদ্ধি-বিবেক সবই বিসর্জন দিতে হবে? এমন রাজনীতি কি সম্ভব যে নীতির দ্বারা মানুষ অন্তত শান্তিতে বাঁচতে পারে? রাজনীতি মানেই দল, আর দল মানেই দলাদলি; আবার যৌথ-উন্নতি চাইলে দল ছাড়া গতি নেই। সুতরাং এ যেন এক গোলক ধাঁধা, যেখানে ''কীসে মানুষের সুখ হয়, কল্যাণ হয়''[১১] এ প্রশ্ন সমাধানহীনভাবে জেগেই থাকে। তবে সৌভাগ্য এইখানেই যে সে তার দেশপ্রেমিক বন্ধু প্রদীপের মতো ব্যক্তিগত প্রেমবিলাসী হয়ে যায়নি। নিজের ভাবনাকে প্রয়োগ করতে ঘুঁটি হিসেবে বেছে নিতে চেয়েছে জয়নদ্দি জেলে এবং তার পেশার জগৎটিকে। মূলহীন যেমন ফুল হয় না, তেমনি রতনের বংশবৃত্তান্তটিও এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। সৎপথে থেকে রোজগারের ধান্ধা করার কথা তারিণী মহাজন সগর্বে প্রচার করে সকলের কাছে। তবে তার পুত্র রতন মহত্ত্বে পিতাকেও ছাপিয়ে গেল। সেই অতিক্রমণের ইতিহাসটি যে তাত্ত্বিক নয় সামান্য জেলে থেকে দু-নৌকার মালিক হয়ে ওঠা জয়নদ্দির জীবনই তার পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

রতনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এইখানেই যে সে জেলেদের দুঃখ-কষ্টকে কপালের দোষ বলে মানতে রাজী নয়। সে মোক্ষম জায়গাটাতেই প্রশ্ন তোলে ''তোমরা এতো খাটো-হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করো রাতদিন, তবু তোমাদের দুঃখ ঘোচে না কেন?''[১২] অবশ্য শুধু দুঃখ ঘোচা নয়, ইলিশমারির চরে দু'বেলা ভাত জোটে এমন ঘরের সন্ধানও দুরূহ। এ থেকে রেহাই পেতেই রতন জয়নদ্দিকে বুদ্ধি দেয় ''জোট বাঁধো''। জেলেদের রোজগারের পথের বড় কাঁটা যে মাছের দামের বখরা নিয়ে মহাজনদের ধূর্তপনা সেটা খুব সহজে রতন জয়নদ্দিকে বোঝায় ''ধরো, কুড়িটাকার মাছ হলো। জাল নৌকাওয়ালা মহাজন কতো পাচ্ছে, না, নৌকার এক বখরা, জালের দেড় বখরা অর্থাৎ আরাই বখরা; সে কেমন জোচ্চুরি ভাবে নিচ্ছে, না, মোট টাকা থেকে আগেই আদ্দেক আর সিকি, মানে দশ টাকা আর পাঁচের অর্ধেক আড়াই অর্থাৎ সাড়ে বারো টাকা কেটে নিচ্ছে। থাকছে... সাড়ে সাত টাকা এবার দু'জন দাঁড়ি আর মাঝির বখরা। যদি সমান সমানও দেয় তাহলে পাচ্ছে মাত্র আড়াই টাকা করে। এটা কি ঠিক?''[১৩] ঠিক যে নয় সে তো জয়নদ্দিরা জানে, কিন্তু এতেই তারা অভ্যস্ত। যদিও এই নিয়মে তাদের জীবনে কোনোদিনই সুখ-শান্তি আসেনি,তবু তারা গত্যন্তরহীন; কেননা ইলিশের মরশুম বাদে অন্যসময়ে মহাজনের দোকানে দেনা বা বন্ধক রেখেই জীবন চলে- সেইসব তারা শোধ করবে কেমন করে? এর উত্তর যেন পরোক্ষে রতন অন্যভাবে দেয় "কুড়ি টাকাই যদি পাও, করো সমান সমান ছ' বখরা- সমস্তটা। এবার তা থেকে দু' বখরা দাও জাল-নৌকার জন্যে মহাজনকে- বাকি তার আধ-বখরা দাও এক-বখরা থেকে ভেঙে। তার গ্যালো আড়াই বখরা। এবার নিক মাঝি-যার দায়িত্বে থাকবে জাল-নৌকা-- দেড় বখরা। বাকি দু' বখরা দু'জন দাঁড়ির। এই হলো আসল হিসেব। ...দ্যাখো, মহাজনের কমলো কিনা।''[১৪]

জয়নদ্দিরা জানে রতনের হিসাব। তারা বর্গাচাষীর জমির ফসলের তিন ভাগের একভাগ প্রাপ্তির কথা যে আইনে পরিণত হয়েছে সেটাও জানে। কিন্তু সে আইন বাস্তবে পরিণত হতে পারেনি জমি ও চাষির পরিমাণ ব্যস্তানুপাতিক বলেই। অভাবী লোকেরা পেটের দায়ে যে কোনো শর্তে রাজী হয়ে যায়; আর এইভাবেই পুঁজিপতির মূলধন উত্তরোত্তর বেড়েই চলে এবং অন্যদিকে হাভাতে লোকেরা আর গরীব হয়। রতন জোর দেয় সুস্থভাবে খেয়ে-পরে বাঁচার অধিকারের উপর। তাই সে বলে '' যে নিয়মে সব মানুষ সুখে থাকতে পারে সেইটাই ন্যায্য আইন।''[১৫] রতন, জয়নদ্দিকে উদ্দীপিত করে নিজের রোজগারের টাকার হিসেব অন্যদেরকে বুঝিয়ে দেবার জন্য।জয়নদ্দি ভয় পায় অন্য কারণে, যদি মহাজন জাল-নৌকা না দেয় হিসেব চাইলে? আর দাঁড়ি-মাঝিরা বড়োই গরীব এতে যদি তাদের মহাজনের দোকান থেকে ধার পাওয়া বন্ধ হয়ে যায় তবে আত্মহত্যা ছাড়া পথ কোথায়? রতন কষ্ট সহ্য করেও লড়াই জারি রাখতে বলে এবং দুই মহাজন বনাম জেলে সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার তুখোড় যুক্তি ''দু'জনের স্বার্থের মুখ চেয়ে তো আর সাড়ে পনেরো আনা মানুষ ন্যায্য প্রাপ্য ছেড়ে দিয়ে একবেলা একসন্ধে খেয়ে এতো কষ্টে বাঁচতে পারে না।''[১৬] আগুন নিয়ে খেলতে শুরু করেছে জয়নদ্দি। তবে সে পরেশ, হরেন,পয়রদ্দি প্রভৃতি জেলেকে শেষপর্যন্ত যে বোঝাতে পেরেছে পয়রদ্দির উক্তিই তার প্রমাণ ''দু' চার টাকা বেশী পাই সে তো মোদেরই লাভ! আর মুঠোবন্দি করে চোখের সামনে অতো টাকা তুলে লেয় মোদের জানে কষ্ট হয়নে? তবুও তো মোদের চোর মনে করে।''[১৭] অন্তত এই উক্তিটি প্রমাণ করে দেয় নিপীড়িত মানুষ নিজেদের মেহনতী স্বার্থরক্ষা করতে গিয়েই একজোট হবার কথা ভাবছে।

জেলেরা যৌথভাবে নিজেদের দাবীতে বহাল থাকে। ইলিশের ভরা মরশুমে এমনভাবে নৌকা-জাল অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকতে দেখে তরব-দি বা তারিণী- দুই মহাজন-ই হাহাকার করে ওঠে। তরব-দি মেজাজ দেখিয়ে, ধমক শুনিয়েও বিশেষ লাভবান হতে পারে না। তার বাড়িতে জেলে-মাঝিদের বৈঠক ফলপ্রসূ হয় না। সকল দাঁড়ি-মাঝিরা জাল তুলে দিয়ে যায় মহাজনের ঘরে। এতোটা আশা তরব-দি করেনি। সে বোঝে শুধু জয়নদ্দির বুদ্ধিতেই জেলেরা এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তারিণী মহাজন হিসেবে সৎ হলেও এই কারসাজির মূলে যে ঘরের শত্রু বিভীষণ হিসেবে রতন আছে তা জানে। এইখানেই দেখি আপন আপন স্বার্থে যখনই টান পড়ে তখন ভদ্রতার সাজানো মুখোশটা মহাজনদের খুলে যায়, এই জায়গাতে তাদের প্রভেদ কোথায়? তবে তারিণীর মধ্যে তার স্ত্রী সুপ্ত বিবেকটিকে জাগিয়ে দিতে চায় ধর্মের দোহাই দিয়ে ''ভগবানের বদলে তুমিই যেন ওদের বাঁচে ড়েখেচ''[১৮] তখন তার মহাজনী মেজাজটি পুনরায় খোলসে ঢুকে গিয়ে জাগিয়ে দেয় এক দয়াবান পুরুষকে- যার মাধ্যমে তার মহাজনী ইগোটাই প্রকারন্তরে আরাম খোঁজে, তাই তারই ফলশ্রুতিতে দেখি টনক নড়েছে তারিণী মহাজনের। তারই আর বৃহৎ ফলাফল হল মাঝিদের দাবীকে মান্যতা জানানো। আসলে শোষণমুক্তির আগুনটি যে জ্বেলেছে তার হাত থেকে প্রকারন্তরে রেহাই পেতে তার এই পথ ছাড়া আর কী-ই বা উপায় ছিল? অন্যদিকে শোষণে যে নগ্ন সেই তরব-দি শত হাঙ্গামা করেও মাঝিদের দিয়ে নৌকা চালাতে পারেনি। বখরার আন্দোলনের পরিণতি একপক্ষে সফলই হয়। অবশ্য এতে যে জেলে-মাঝিদের সম্পূর্ণ দুঃখ ঘুচবে এমন নয়, যদি সকলের নিজের জাল-নৌকা হয় তবেই তা দূর হতে পারে। অবশ্য এতদিনের প্রচলিত প্রথাকে তারা যে ভাঙতে পারলো সেটাও কম বড় প্রাপ্তি নয়। ইস্কুল গড়তে তরব-দির দানকে আমরা ছোট করবো না, কিন্তু এটাও মনে রাখবো এই দান স্বতঃস্ফূর্ত নয়, ঈর্ষাকাতর।

জয়নদ্দি, হরেন প্রমুখ জেলের মাছের সন্ধানে উপরি রোজগারের তাগিদে সমুদ্রযাত্রার দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতিকে কাজে লাগায় তরব-দি। হরেনের পত্নী সিন্ধুর খুনের মূলেও ঐ দুষ্ট মহাজন। পুলিশ প্রশাসন নিজের হাতের মুঠোয় রেখেও শেষপর্যন্ত পাগল হরেনের হাতে খুন হয় সে। শেষপর্যন্ত শান্তি নামে ধীবর পাড়ায়। রূপকথার গল্পের মতোই আমরা দেখি পাঁচজন লোক আর দুটো নৌকা নিয়ে জয়নদ্দি ক্ষুদ্র মহাজন হয়ে বসেছে।এক সামান্য মেছুড়ে থেকে মহাজন মর্যাদায় উত্তীর্ণ হওয়াতে অনেকেই এই পরিণতিকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে পারেন। তবে আমরা জানি লেখক 'সবিনয় নিবেদন' অংশে বলেছিলেন ধীবর শ্রেণীর জীবনের নিখাদ উপস্থাপনই তাঁর কাঙ্ক্ষিত। তর্কের খাতিরে বলা যেতেই পারতে আসল সোনায় 'খাদ' মিশলে তবেই যদি তা মজবুত হয় তাহলে উপন্যাসের মতো বানিয়ে তোলা

শিল্পকর্মে শিল্পীর অন্তত সেই স্বাধীনতাটুকু প্রাপ্য যাতে আসল আর 'খাদ' মিশিয়ে শিল্পকর্মটিকে মানবজীবনের প্রতিনিধিস্থানীয় আশাবাদী বয়ান হিসাবে গড়ে তোলা যায়।

তথ্যসূত্র :

১। জব্বার, আব্দুল : 'ইলিশমারির চর',পরিমার্জিত নতুন সংস্করণঃ জানুয়ারী, ২০০৯, লেখা প্রকাশনী, কল-৭৩, 'সবিনয় নিবেদন' অংশ, পৃষ্ঠা অনুল্লেখিত
২। জব্বার, আব্দুল : 'ইলিশমারির চর', পরিমার্জিত নতুন সংস্করণঃ জানুয়ারী, ২০০৯, লেখা প্রকাশনী, কল-৭৩, পৃঃ- ১২২
৩। চক্রবর্তী, সুমিতা : 'উপন্যাসের বর্ণমালা', দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণঃ জানুয়ারী,২০০৩, পুস্তক বিপণি, কল-৯, পৃঃ- ১৭৫
৪। জব্বার, আব্দুল : 'ইলিশমারির চর', পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০০৯, লেখা প্রকাশনী, কল-৭৩, পৃঃ -১২২
৫। তদেব, পৃঃ-৬
৬। তদেব, পৃঃ-৭
৭। তদেব, পৃঃ-১৮
৮। তদেব, পৃঃ-২০
৯। তদেব, পৃঃ-৪৪
১০। তদেব, পৃঃ-৪৪
১১। তদেব, পৃঃ-৪৫
১২। তদেব, পৃঃ-৭১
১৩। তদেব, পৃঃ-৭১
১৪। তদেব, পৃঃ-৭১
১৫। তদেব, পৃঃ-৭২
১৬। তদেব, পৃঃ-৭৫
১৭। তদেব, পৃঃ-৮৫
১৮। তদেব, পৃঃ-৯৮